স্বপ্নময় চক্রবর্তী ও পরিবেশ সচেতনতার গল্প

সঞ্জয় মালিক

সারা পৃথিবী জুড়ে রাষ্ট্র-নেতারা প্রকৃতি-পরিবেশ নিয়ে নতুন করে চিন্তা ভাবনা শুরু করেছে। যদিও প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় শুধু পৃথিবী বিপন্ন নয়, মানব সভ্যতাও খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে। আমরা উন্নয়ন নিয়েই ব্যস্ত। এই উন্নয়ন করতে গিয়ে নির্বিচারে গাছ কাটা, পুকুর ভরাট করা, গৃহপালিত পশু চরে খাওয়ার সরকারি খাস জমি দখল করে ফ্ল্যাট তৈরি করা, এর ফলে প্রকৃতি-পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। এখন প্রায় সর্বত্র পরিবেশ ও দূষণ নিয়ে চিন্তিত। নদীর জলে প্রতিদিনকার বর্জ্য পদার্থ ভাসিয়ে দিই, কখন নদীর স্বাভাবিক প্রবাহমানতাকে রুখে দিয়ে ইচ্ছা মতো বাঁধ তৈরি করি। ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক প্রভাব মানুষের স্বাভাবিক জন-জীবনকে ব্যাহত করেছে। এর সুদূর প্রসারী প্রভাব মানব শরীরে ফেলছে। কারখানার রাসায়নিক পদার্থ পরিবেশের ক্ষতিসাধন করছে। বাতাস দূষিত হচ্ছে কলকারখানার ধোঁয়া, গাড়ির ধোঁয়ায়। আকাশ-বাতাস-জল-বায়ু-নদী-সমুদ্র-পাহাড় সর্বত্র দূষণ। এর ফলে ঋতু পরিবর্তন প্রভাবিত হচ্ছে। প্রকৃতির খেয়ালে অতিরিক্ত রোদ-বৃষ্টি, শীত-গরম প্রভাব বিস্তার করছে। ঋতুচক্র ক্রমশ পরিবর্তন হচ্ছে ক্যালেন্ডারের নিয়ম মেনে নয়, পরিবর্তন হচ্ছে আঞ্চলিক আবহাওয়া ও জলবায়ু। কত পাখি আকাশে দেখা যেত সেগুলি আজ বিলুপ্তির পথে। দূষিত আকাশ, গাছ নেই, কোথায় উড়বে পাখি? কোথায় বসবে? শুধু পাখি নয় আরও কত পোকা-মাকড়-প্রাণী বিপন্ন হতে চলেছে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, ইকলজিক্যাল ব্যালান্সের সমতা নষ্ট হচ্ছে। তবু মানুষ সচেতন হচ্ছে না।

পরিবেশের সংকট আসলে মানব সভ্যতার সংকট। প্রকৃতির রুদ্ধ রূপের কাছে মানুষ আজ অসহায়। আমরা দেখেছি একের পর এক ঘূর্ণিঝড় 'আইলা', 'আমফান', 'যশ' - এর প্রভাবে সুন্দরবনের লাগোয়া বসবাসকারী মানুষের জীবন আজ বিপন্ন। শুধু মানুষ নয়, প্রায় সমগ্র জীব জগত। গোটা পৃথিবীর মানুষ আজ পরিবেশ নিয়ে চিন্তিত। ২০১৯ সালে ডিসেম্বরে স্পেনের মাদ্রিদে সবশেষ 'আন্তর্জাতিক জলবায়ু সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। সিদ্ধান্ত হয় সব দেশকে পরিবেশ রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। তাই বিভিন্ন জায়গায় পরিবেশকে বাঁচানো জন্য সবুজ বাঁচাও কমিটি, পরিবেশ রক্ষা কমিটি ইত্যাদি শুরু হয়েছে। আবার কোথাও কোথাও পরিবেশকে রক্ষার জন্য আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে। দেশের বিজ্ঞানীরাও এই বিষয়ে গবেষণারত। পরিবেশবিদরাও রীতিমতো চিন্তিত। এই বিষয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে। সাহিত্যও পিছিয়ে নেই। পরিবেশকেন্দ্রিক সাহিত্য রচিত হয়েছে। কবি-সাহিত্যিকরা পরিবেশ সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনা তাঁদের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। কখনো কখনো পাঠককে সচেতন করতে চেয়েছেন। আমরা পরিবেশ রক্ষার্থে ৫ইজুন পরিবেশ দিবস পালন করি। সারা দেশে এই দিন বৃক্ষরোপণ করি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য। তবে রবীন্দ্রনাথের হাতে প্রথম বৃক্ষরোপণ শুরু হয়। বাইশে শ্রাবণ বৃক্ষরোপণের মধ্য দিয়ে শান্তিনিকেতনে আশ্রমবাসীরা রবীন্দ্রনাথের তিরোধান দিবস পালন করেন। অবশ্য শান্তিনিকেতনে প্রথম বৃক্ষরোপণ উৎসবের সূচনা হয়েছিল কবির ৬৪তম জন্মদিনে, ১৩৩২ বঙ্গাব্দের পঁচিশে বৈশাখ। সে বছর উত্তরায়ণের উত্তর দিকের পথের ধারে কবি 'পঞ্চবটী' অর্থাৎ অশ্বত্থ, বট, বেল, অশোক ও আমলকী পাঁচটি গাছ রোপণ করেন। পৃথিবীর মরু বিজয়ী বৃক্ষকে রবীন্দ্রনাথ 'আদিপ্রাণ' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সমস্ত প্রাণীর পূর্বপুরুষ বলে কবির কাছে বৃক্ষবন্দনা মানে প্রাণের উপাসনা। প্রথম বৃক্ষরোপণ উপলক্ষ্যে রচিত 'মরু বিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে' গানটি গাওয়া হয়। তাছাড়া 'বলাই' গল্পটি পাঠ করা হয়।

গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়, মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

রবীন্দ্রনাথ এই গল্পে দেখিয়েছেন শিমূল গাছ ও বলাইয়ের আত্মিক সম্পর্ককে- ''দেখলুম একটা শিমূলগাছের চারা বাগানের খোওয়া-দেওয়া রাস্তার মাঝখানেই উঠেছে।...এতটুকু যখন এর অঙ্কুর বেরিয়েছিল, শিশুর প্রথম প্রলাপটুকুর মতো, তখনই এটা বলাইয়ের চোখে পড়েছে। তারপর থেকেই বলাই প্রতিদিন নিজের হাতে একটু একটু করে জল দিয়েছে, সকালে বিকালে ক্রমাগতই ব্যগ্র হয়ে দেখেছে কতটুকু বাড়ল। শিমূলগাছ বাড়েও দ্রুত, কিন্তু বলাইয়ের আগ্রহের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। যখন হাত দুয়েক উঁচু হয়েছে তখন ওর পত্রসমৃদ্ধি দেখে ভাবলে এ একটা আশ্চর্য গাছ, শিশুর প্রথম বুদ্ধির আভাস দেখামাত্র মা যেমন মনে করে আশ্চর্য শিশু।''[১] এখন সারা দেশ জুড়ে বনমহোৎসব এবং সামাজিক বনসৃজনের যে কর্মযজ্ঞ চলছে তার পথিকৃৎ হচ্ছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বৃক্ষকে ভালোবাস, প্রকৃতির সঙ্গে আত্মিক অনুভবের নান্দীপাঠ যে শৈশবেই শুরু করা উচিত ছিল তা তিনি বুঝিয়েছিলেন। বিষ্ণু দে অরণ্যচ্ছেদনের বিরুদ্ধে 'বন্যদোল' কবিতায় লিখছেন-

''শালে ও সেগুনে সিসুতে ও গম্‌হারে
সকরারী বনে কার সাড় জাগে, কারা ভাঙে আড়মোড়া।
তীব্র বিধুর রূপের এ সম্ভারে
নিঠুর দরদী গোখ্‌রা চন্দবোড়া!''[২]

তাছাড়া জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রকৃতি পরিবেশ উপর যে গভীর প্রত্যয় তা 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি', 'আবার আসিব ফিরে' ইত্যাদি কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতি প্রেমিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও পরিবেশ রক্ষায় সচেষ্ট। 'আরণ্যক' উপন্যাসের কথক সত্যচরণ অরণ্যভূমিকে রক্ষা করার চেষ্টা করলেও উপরওয়ালার নির্দেশ মানতে বাধ্য হয় । কিন্তু তার মন সায় দেয় না-

> ''আমার উপরওয়ালারা ক্রমাগত আমাকে চিঠি লিখিয়া তাগাদা করিতে লাগিলেন, কেন আমি এখানকার জমি প্রজাবিলি করিতেছি না। আমি জানি আমার তাহাই একটি প্রধান কাজ বটে, কিন্তু এখানে প্রজা বসাইয়া প্রকৃতির এমন নিভৃত কুঞ্জবনকে নষ্ট করিতে মন সরে না। যাহারা জমি ইজারা লইবে, তাহারা তো জমিতে গাছপালা বনঝোপ সাজাইয়া রাখিবার জন্য কিনিবে না-কিনিয়াই তাহারা জমি সাফ করিয়া ফেলিবে, ফসল রোপণ করিবে, ঘর-বাড়ি বাঁধিয়া বসবাস শুরু করিবে - এই নির্জন শোভাময় বন্য প্রান্তর, অরণ্য, কণ্ডী, শৈলমালা জনপদে পরিণত হইবে, লোকের ভিড়ে ভয় পাইয়া বনলক্ষ্মীরা ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইবেন- মানুষ ঢুকিয়া এই মায়াকাননের মায়াও দূর করিবে, সৌন্দর্যও ঘুচাইয়া দিবে। সে জনপদ আমি মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখিতে পাই।''[৩]

এছাড়া সমসাময়িক পরিবেশকেন্দ্রিক সমস্যা সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠেছে। এইসব সাহিত্যকে পরিবেশ সচেতন সাহিত্য বা পরিবেশকেন্দ্রিক সাহিত্য হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ইংরেজিতে যাকে - "Environmental Literature', 'Eco-logical Literature', 'Eco Poetry- Eco Novel - Eco Story' ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করা হয়। এইসব সাহিত্যের সাহিত্য মূল্য ছাড়াও পরিবেশগত একটা মূল্যও আছে। পরিবেশ সংক্রান্ত নানান সমস্যা সাম্প্রতিককালে যাঁদের লেখায় বিষয় হয়ে উঠছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য নাম স্বপ্নময় চক্রবর্তী। পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয় যেগুলি পরিবেশ বিজ্ঞানীদের চর্চার বিষয় হতে পারত সেগুলি তাঁর গল্পে গুরুত্বের সঙ্গে উঠে এসেছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'চারণক্ষেত্র' (অনুষ্টুপ ১৯৯১ খ্রি.),

'ক্যারাক্কাস্' (শারদীয়া বর্তমান, ১৯৯২খ্রি.), 'ফল ছোয়ানো' (শারদীয় বর্তমান, ২০০১ খ্রি.) পরিবেশ বিষয়ে গল্পগুলি আলোচনা করা হল-

চারণক্ষেত্র (অনুষ্টুপ ১৯৯১) ঃ অবৈধভাবে খনন ও খাসজমি দখল করে ব্যবসা ফাঁদে জমি মাফিয়ারা। এরা অজান্তে বা জেনেও পরিবেশের ইকলজিক্যাল ব্যালান্স নষ্ট করছে। এরই প্রতিবাদ করে গিরিধারী, সাতান্ত পরবর্তী গ্রামের কবি গাইয়ে। তারজন্য তাকে রাজনৈতিক নেতা কিংবা প্রশাসনের কাছে হেনস্থার স্বীকার হতে হয়। অবৈধভাবে জমি ব্যবসা সমাজে গভীরে প্রবেশ করেছে। গ্রামের রাজনৈতিক ধান্দাবাজরা জমির দালালি ও মস্তানি করে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে অবৈধভাবে মাটি বিক্রি করে। এরই প্রতিবাদ করে গিরিধারী তার কবি গানের মধ্য দিয়ে। কিন্তু তার নামেই নিন্দা চালায় রাজনৈতিক দালালরা। তবে গিরিধারী জেলা সদরে যে লোকসংস্কৃতির উৎসব হয়েছিল সেখানে তথ্যমন্ত্রীর হাত থেকে একটি মানপত্রসহ কাস্তে হাতুড়ি খোদাই করা ফলক পেয়েছিল। গিরিধারীর কাছে এই পুরস্কার অনেক গর্বের। শহরের নয়, গ্রামে টিনের চালা ঘরের বাসিন্দা সে। সাপ্তাহিক চব্বিশ পরগণা বার্তা পত্রিকার সাংবাদিক অরিজিৎ সিংহ গিরিধারীর কাছে ইন্টারভিউ নিতে আসে। সাঁইপুর গ্রামের মাটি বিক্রির অভিযোগ করতে এস.ডি.ও-এর কাছে গিরিধারীও গিয়েছিল। মাটির কারবারি রত্নেশ প্রাণের হুমকি দিতে লোক পাঠিয়েছে। এখানের মানুষ ঠাকুর রামকৃষ্ণের বাণী - 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' - হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। রত্নেশ যুবকদের জমির দালালিতে লাগিয়ে দিয়েছে। এই সম্বন্ধে যে প্রতিবাদ করে তাকেই প্রাণের হুমকি দেয়। গিরিধারী এই হুমকি উপেক্ষা করে তার গান লেখেন। তিনি তো শিল্পী মানুষ তাকে ভয় পাওয়ানো যায় না। রত্নেশ রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেই হয়। রত্নেশ কনট্রাক্টরি করে এবং জমি দালালি করে পয়সা করে, সাঁইপুর গ্রামের গোচরণ ভূমি থেকে মাটি বিক্রির ব্যবসা করে। আসলে নিজের স্বার্থে এই ভূমিকে পুকুর বানাতে চায় যাতে তার মুনাফা অধিক। কবিয়াল তা তুলে ধরেন কবিগানের মধ্য দিয়ে -

''সাঁইপুর গ্রামে আছে গোচরণ ভূমি।
দূর্বাদলে ঢাকা থাকে উঁচু ভাঙা জমি।।
গৃহস্থের গোরুগুলি চরিত সেথায়।
তারপরে দুঃখ কথা কি কহিব হায়।।
পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যবস্থার নামে।
রত্নেশ রায় আসে সাঁইপুর গ্রামে।।
গোচারণ ভূমি পরে দৃষ্টি পড়ে তার।
জিজ্ঞাসিল এ জমির মালিকানা কার?
সবে বলে এ জমির মালিকানা নাই।
ডাকাতের মাঠ নামে জানে যে সবাই।।
সেটল্‌মেন্ট রেকর্ড ইহা লিখা গোচারণ।
ব্যবহার করিতে পারে সর্বসাধারণ।

এবার রত্নেশ রায় ঘন ঘন আসে যায়
জুটাল বেকার ছেলে কিছু।
লোভ ওই মাঠ পানে কুমন্ত্রণা দিল কানে
ক্যাডেরেরা ছুটে পিছু পিছু।।
মাটি কাটে লরি ভরে মাটির ব্যবসা করে
রত্নেশসনে কিছু যুবা।
প্রতিবাদ নাহি হয় সবাই যে ভয়ে রয়
গোচারণ ভূমি হয় ডোবা।।" [৪]

শুধু পঞ্চায়েত প্রধান নয়, জেলাস্তরের নেতা মাধব চৌধুরী পর্যন্ত যুক্ত এই কাজে। ওরা অজান্তেই পরিবেশের ইকলজিক্যাল ব্যালেন্স নষ্ট করছে। এদের সঙ্গে হারাধন নস্কর, গিরিধারী কবিয়াল পেরে উঠতে পারে না। তাদের পার্টির লোক বলতে অস্বীকার করে মাধব চৌধুরী। রাজনৈতিক নেতারা রাজনীতির বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে রিপোর্টারের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর দেয়-

''বাজে কথা। ওদের কোনো বেস নেই। কিছু কংগ্রেসি আর নকশাল ওদের এক্সপ্লয়েট করছে। জনগণ ওদের সঙ্গে নেই। কেনই বা থাকবে বলুন, ওই ডাঙা জমিতে গ্রামবাসী কি পায়? শুধু আগাছা হয়। ক'জনেরই বা গরু আছে, যাদের গরু আছে তাদের বোঝান হচ্ছে গরুকে আগাছা না খাইয়ে সুষম খাবার খাওয়ালে দুধ অনেক বেশি হয়। এছাড়া কতগুলো লেবার এনগেজড্ হয়েছে ওই মাটি কাটার জন্য। মজুরেরা কাজ পাচ্ছে।'[৫]

রাজনৈতিক নেতা রিপোর্টারকে পর্যন্ত হুমকি দেয়, সরকারি বিজ্ঞাপন ওই পত্রিকায় দেওয়া হবে না বলে। কিন্তু গিরিধারী কোন কিছুই মানে না। ডাকাতের মাঠে ১৪৪ ধারে জারি হয়, এখানে গরু বাঁধা পর্যন্ত নিষেধ হয়। নিজের গরু না থাকলেও গোবিন্দ ভুঁইয়ার গরু নিয়ে এসে তিনি মাঠে বাঁধে। পুলিশ-রাজনৈতিক নেতার যোগসাজশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে পরিবেশ রক্ষার চেষ্টা করে। তবে যে গিরিধারী ছেলেকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিল, তারজন্য পিছিয়ে আসতে হয়। কারণ তার বেকার ছেলেকে সুপারভাইজার টোপ দেয় রত্নেশ। তাই তাকে থানায় যেতে নিষেধ করে ছেলে। কিন্তু গিরিধারী ছেলে স্বপনকে স্মরণ করায় বৌ মরেছে, মেয়ের বিয়ে দিয়েছি, আর আমার কেউ নেই। আসলে কিছু মানুষের রক্তে থাকে প্রতিবাদ করার বীজ। গিরিধারী সেই জাতের মানুষ। তবু ছেলের জন্য বুক ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসে। এই সংকট তো গিরিধারীর শিল্পী সত্তার সংকট। তাই গিরিধারী বলে আমাকে তালা বন্ধ করে দিয়ে তুই যা। পুত্র স্বপনের এগিয়ে যাওয়া বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখে আর কবিয়াল ভাবে-

''নদীর শরিলি চড়া পড়লি সে নদী লষ্টে হল না, সেখানে কৃষিক্ষেত্তর হয়, একটা গোচারণ ভূমি ছিল, সেটা যদি জলাভূমি হয়, হোক দুঃখ নাই, কিন্তু এই হওয়া না হওয়ার ইতিহাস কে বানায়, জনগণ - নাকি ক'টা লোকের পয়সার লোভ?"[৬]

সত্যিই তো ইতিহাস পিছোয় না এগিয়ে যায়। কিন্তু কবিয়াল গিরিধারী তো পিছিয়ে যায়, শিল্পী তো পিছোয় না? এর উত্তর খুঁজতে সাদা কাগজ খোঁজে শিল্পী গিরিধারী। আসলে এ পিছিয়ে পড়া নয়-

''এগোলে সম্মুখপানে কভু বামে কভু ডানে
কভু হেঁটে, কখনো বা লম্ফ দিতে হয়

লম্ফ দিবার তরে কিছু তো পিছেই সরে

তাহা তো পিছিয়ে পড়া নয়”[৭]

কবিয়াল গিরিধারী মতো মানুষরা সমাজে আছে বলেই পরিবেশ ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে এখনো প্রতিবাদ হয়। সমাজে তারা যে শ্রেণির মানুষ হোক না কেন? স্বপ্নময় চক্রবর্তী আকাশবাণীতে চাকরি করার সময় পরিবেশ সংক্রান্ত ছোট ছোট অনুষ্ঠান করতেন। এই গল্পগুলিতে তার প্রভাব আছে। গিরিধারীর প্রতিবাদ যেন লেখকেরই প্রতিবাদ এবং পাঠককে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করেন।

‘ক্যারাক্কাস্’ (শারদীয়া বর্তমান, ১৯৯২) : কারখানার এক শ্রমিকের আত্মকথন ‘ক্যারাক্কাস্’। কারখানার বর্জ্য পদার্থের দূষণ বিপন্ন করে তুলতে পারে একটি উপজাতিকে। মানুষের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলতে পারে। কারখানার অ্যাসিড, অ্যালডিহাইড, কিটোন, আর্সেনিক, সোডা মিশ্রিত জল পড়ে বিষপুকুরে। এই বিষ পুকুরে কোন প্রাণী-ই জন্মানো সম্ভব নয়। বিষ পুকুরে পাড়ের গাছগুলো সব মরে গেছে। আশ্চর্যভাবে বিষপুকুরে জন্ম নেয় রঙিন মাছ, পুকুরে গ্যাসের বুটবুটিকে হারিয়ে প্রাণের বটিবটি দেখা যায়। রঙিন মাছ আবিষ্কারের প্রথম দাবিদার কারখানার শ্রমিকই। কিন্তু উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক আবিষ্কারের কৃতিত্ব নেয় জোর করে। শিক্ষক বিষাক্ত পুকুর থেকে ছিপের বড়শিতে আঠালো টোপ দিয়ে মাছটাকে ধরে। মাছের গায়ে কোনো আঁশ নেই, ড্যাবা-ড্যাবা চোখ, গিরগিটির মতো গা খরখরে -

> ‘‘স্যার কীরকম গম্ভীর হয়ে গেলেন। চোখ স্থির। দেহ স্থির। আস্তে আস্তে মন্ত্র পড়ার মতন বলতে থাকলেন- ইউরেকা, ইউরেকা। মিউটেশন। নিউ গেস্ট। নিউ স্পেসিস। নতুন প্রজাতি। নাম দিলাম ক্যারাক্কাস। আবিষ্কার করেছি আমি। আমিই দেখেছি এটা পৃথিবীতে প্রথম।’’[৮]

উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক জোর করে প্রথম আবিষ্কারের কৃতিত্ব নিতেই শ্রমিককে বিষপুকুরে ঠেলে ফেলে দিলে তার শরীরে পরিবর্তন আসে। বিষাক্ত জলে শ্রমিকের শরীরের চামড়া হয় গিরগিটির মতো কুঁচকানো খড়খড়ে, চুল সাদা, চোখ বের হয়ে আসে। বাড়িতে নিজের বউ তাকে চিনতে পারে না। স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্যে দূরত্ব বাড়ে। খবরের কাগজে শিক্ষকের ছবিসহ আজব মাছের কথা প্রকাশ পায়। কোম্পানি বিষপুকুরের মাছের চামড়া থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গ্লাভস তৈরি করে। এই গ্লাভস অ্যাসিড, অ্যালকালি, এবং রেডিও অ্যাকটিভিটির হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করে। কোম্পানির এই বিষপুকুর কিনে আমেরিকা, জার্মানির কোম্পানিরা বিসনেস করতে চায়। গ্লাভসের চাহিদার মেটানোর জন্যই কোম্পানি আরো বিষপুকুর অর্থাৎ সারপুকুর তৈরি করে রঙিন মাছ চাষ করতে চায়

> ‘‘একদিন আমাদের ফোর ম্যান একটা মুখোশ পরে অফিসে এলেন। খুব গম্ভীর গম্ভীর মুখের মুখোশ। খড়খড়ে চামড়ার। প্রচুর ব্যক্তিত্ব। সবসময় ব্যক্তিত্ব। ওই ক্যারাক্কাস মাছের চামড়ায় তৈরি। এরকম একটা মুখোশের হেভি দাম। অ্যাসিড-অ্যালকালি প্রুফ। ফায়ার-রেডিও অ্যাকটিভিটি প্রুফ। উনি বললেন, আমাদের এই কোম্পানির একটা নতুন ইউনিট খোলা হয়েছে। ওখানে ক্যারাক্কাসের চামড়া থেকে অ্যাপ্রন-ট্যাপন হচ্ছে, মাস্ক হচ্ছে।’’[৯]

বিষপুকুর ম্যানেজমেন্টের অতি লোভে ও অদূরদর্শিতায় নতুন প্রজাতি অর্থাৎ ক্যারাক্কাস সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। ‘অতি লোভে তাঁতি মরে’ প্রবাদে মতো কোম্পানির অবস্থা হয়। কোম্পানির সাহেবদের মনের সুখ নষ্ট হয়। শিক্ষকের মাথায় হাত পড়ে।

কারখানায় অ্যাসিড লিক হলে শ্রমিকের গায়ের চামড়া গিরগিটির মতো হওয়ায় তার কিছুই হয় না, অন্যদের চোখ নষ্ট হয়ে যায়। কোম্পানিকে চোখ নষ্ট হওয়া শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দিলেও তাকে বঞ্চিত করা হয়।

কোম্পানি থেকে কারখানার শ্রমিক মুখোশ পেলেও স্ত্রীর সাথে দাম্পত্যে মিলিত হতে পারে না। শ্রমিকের স্ত্রী মৃত্যুর ভয় উপেক্ষা করে মানুষের তৈরি বিষপুকুরে স্নান করে স্বামীর মতো হয়ে যায়। তাদের দাম্পত্যে আর অসুবিধা হয় না। বিষাক্ত দুজন দম্পতির মিলনে জন্ম নেয় ভূতের মতো অদ্ভুত এক সন্তান। পিতার মতোই এ সন্তানের চামড়া খড়খড়ে, চোখ ড্যাবা-ড্যাবা। অদ্ভুত এই সন্তানকে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ দেখতে আসে। স্যার শ্রমিকের এই অদ্ভুত সন্তানের নতুন নামকরণ করেন-

> ''স্যার আমার ছেলের চামড়া টিপছেন, কাপড়ের জমিন দেখার মতো শিশুর ঝুলে থাকা চামড়ার দুপাশে আঙুল লাগিয়ে ঘষছেন। স্যার হাসলেন। বললেন, বাঃ। তারপর স্থির হলেন। চোখ স্থির, দেহ স্থির। মন্ত্র পড়ার মতো বলতে থাকলেন - ইউরেকা ... ইউরেকা...নতুন প্রজাতি। নিউ স্পেসিস। ক্যারাক্কাস..।''[১০]

অসহায় পিতা প্রত্যক্ষ করে তার ভবিষ্যত প্রজন্মকে। লেখক শেষপর্যন্ত বিষপুকুরের নয়, জীবনের বুটবুটিকে জয়ী করে। মুখোশে লেগে থাকে জীবনের-ই হাসি। এখানে রাসায়নিক দূষণের মাত্রা অন্য তাৎপর্য বহন করে। মনে পড়ে যায় ১৯৮৪ খ্রি. ডিসেম্বরে ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার কথা। যাদের শরীরে গ্যাস ঢুকেছে সারাজীবনের মতো তারা অসুস্থ হয়ে গেছে। আজও সেখানে বিকলাঙ্গ সন্তানের জন্ম হয় কিংবা এখনো ছেলে মেয়েদের বিবাহ হতে চায় না। হাত পা অসাড়, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, যৌন-সক্ষম নয় অনেকেই। 'গ্যাস ভিক্টিম' তকমা লেগে আছে তাদের গায়ে। আজও ইউনিয়ন কার্বাইডের বর্জ্য পদার্থ সরানোর ব্যবস্থা হয়নি। আমরা প্রত্যক্ষ করছি গ্যাস দুর্ঘটনার ভয়াবহতা।

'ফুল ছোঁয়ানো' (শারদীয় বর্তমান, ২০০১): এই গল্পে হীরকের মধ্য দিয়ে উঠে আসে আর্সেনিক আক্রান্ত এক দরিদ্র মুসলমান পরিবারের জীবন সমস্যার কথা। 'জলের আর এক নাম জীবন' - এই প্রবাদের অর্থ অনুসারে জলের মধ্যে আর্সেনিকের প্রভাবে জীবন কীভাবে অতিবাহিত হয় তারই বর্ণনা। হীরক চাকরি করে কিন্তু সে সিরিয়ালের চিত্রনাট্য লেখে। ক্রাইম সিরিয়ালের চিত্রনাট্য বিষয় ভাবতে ভাবতে শিয়ালদহ থেকে বনগাঁ ট্রেনে ওঠে। জানালার ধারে বসে ছিল হীরক, ব্যাগ না নিয়ে নেমে পড়ে, ব্যাগের মধ্যে ছিল সিরিয়ালের চিত্রনাট্য। এই হারিয়ে যাওয়া চিত্রনাট্য নিয়ে হীরক চিন্তায় পড়ে, তবে বনগাঁর গাইঘাটা থানার বাঁশপোতা গ্রামের বাসিন্দা পালা লিখিয়ে আসগর আলি ব্যাগটা নিয়ে গেছে ফোন করে জানায়। হীরক আশায় বুক বাঁধে। মিনারেল ওয়াটারের বোতল, কয়েকটা টফি এবং গোটা দশেক সন্দেশ কিনে হীরক আসগর আলির বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। রাস্তায় একজন লোকের মাধ্যমে জানতে পারে ঐ মুসলমান পাড়ায় বাড়ি। হীরক আসগর আলির বাড়িতে পৌঁছালে -

> ''হাতজোড় করলেন আসগর আলি। ওর চুল দাড়ি সাদা, রোগা চেহারা, হাত জোড়া করেই আছে ওর নখের রং কালো, হাতের চামড়া গিরগিটির গায়ের মত খরখরে।''[১১]

আসগর আলি আপ্যায়ন করে হীরককে, মোড়া নিয়ে এসে বসতে দেয়। আসলে হীরক লক্ষ্য করছিল আসগরের খুঁড়িয়ে হাঁটা, পায়ের আঙুল এত মোটা, কালচে, ফেটে রক্ত শুকিয়ে গেছে। ভ্রুতে চুল নেই মনে হয় নিশ্চয়ই কুষ্ঠ। আসগর তাকে পানি খেতে বললে আর্সেনিকের ভয়ে খায় না। আর আসগর তাচ্ছিল্যের সুরেই বলে - 'এক গ্লাস খেলে কিছু হবে নে। আমরা তো রোজ খাই কি করব।' হাসপাতালের ডাক্তার লেকচার দেয়, খবরের কাগজে ওদের ছবি ওঠে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। কাগজে হোডিং হয় 'আমি জেনে শুনে বিষ পান করছি'। পশ্চিমবাংলার আট জেলায় বত্রিশ লক্ষ মানুষ আর্সেনিক যুক্ত জল পান করে।

এরমধ্যে দশ হাজার মানুষ আর্সেনিক রোগে আক্রান্ত এবং তিনহাজার মানুষ মৃত্যুর জন্য দিন গুনছে। এই ভয়াবহ অবস্থায় মানুষ বাস করছে। আসগর আলি এই বিষয় নিয়ে পদ্য লিখেছিলেন - এখন আর লিখতে পারে না হাত অসাড়ের কারণে। তবে লেখক কালিয়াদহের অনুষঙ্গ আনে, সেখানে কৃষ্ণ রক্ষা করেছিল। আর্সেনিকে আক্রান্ত গরীব মানুষদের রক্ষা করবে কে?

> ''মাটির তলার পানি বিষ হয়ে গেছে, কিন্তু ডুমরা বিলের জল পাম্প করি ট্যাঙ্কিতে উঠোয়ি পাইপে পাঠালি ভালো পানি পাই। কলকাতার ঘরে ঘরে কলের জল।''[১২]

কলকাতার লোক পুণ্য বলে ভালো জল পাচ্ছে। আসগর প্রশ্ন করে আমরাও তো ভোট দিয়েছি তাহলে আমাদের আর্সেনিক যুক্ত জল কেন? রাজনৈতিক নেতার উত্তর-তোদের হাত এখন এমন হয়নি যে বোতাম টিপতে পারবি না। হীরক পরিস্থিতির চাপে ছোট্ট একচুমুক জল ও পাটালি গুড় ভেঙে খায়। আর্সেনিক গেল হীরকের পেটে। আসগর আলি পালা লেখা ছাড়াও কাদির হাটি গ্রামে ডিপ টিউকল চালায়। ধান গাছের মধ্যেও আর্সেনিক যুক্ত জল যায়। এই ধান থেকে চাল তো সবাই খায় হীরককে একথাই বলে আসগর আলি।

কাব্যখাতা ফেলে আসগর ফতিমাকে কোলে তুলে নেয়। আর্সেনিকে আক্রান্ত হয়ে বাচ্চা ফতিমার এই অবস্থা -

> ''বাচ্চাটার পা দুটো লিকলিকে । ডানহাত খুব অপুষ্ট। বাঁ হাতটা কিছুটা ভাল। মুখ দেখে মনে হয় সাত আট বছর বয়েস। কিন্তু শরীর দেখে বছর তিনেকের বেশি মনে হয় না। যদ্দুর মনে হয় রিকেট। হীরক তো ডাক্তার নয়। ব্যাঙ্কে কাজ করে মাত্র। চিত্রনাট্য লেখে শখে। এখন শখ নয়, লোভে। মেয়েটার করুণ ঠ্যাং ঝুলছে।''[১৩]

ব্যস্ততার কারণে হীরককে উঠতে হয়, তবে টফিগুলি কি করবে, ফতিমা ছাড়া আর বাচ্চাকাচ্চা ফুল ছোঁয়াতে গেছে। তবে ফুল ছোঁয়ানোর মানে বোঝে না হীরক, তাই টফিগুলো জলচৌকির উপরে রাখে, বাচ্চাদের দেবার জন্য। ব্যাগের ভিতর থেকে দশ টাকার মিনারেল ওয়াটার বের করে আসগরকে দেয় -

> ''ফতেমাকে হাঁ করায়, বলে নে ফতিমা। পানি খা, পানি খা, আর্সেনিক নাই। বাচ্চাটার মুখ ভেসে যায় জলে। বাচ্চাটাকে কোলে নিয়েই আসগর ঘরের ভিতরে যায়। হীরক আসগরের কণ্ঠ শোনে- খাও, খাও, এক ঢোক মুকি দ্যাও। আসগরের বউ-এর কণ্ঠ- তুমি খাও।''[১৪]

আসগরের কথাতেই জানা যায় এ গাঁয়ের ছেলেদের বে-সাদি হয় না। ভিন গাঁয়ের লোক মেয়ে দিতে চায় না। এটা সামাজিক সমস্যায় দাঁড়ায়। গাঁয়ের লোকদের গভর্ণমেন্ট থেকে টিউকলের জল খাওয়া নিষিদ্ধ বললেও পুকুরের জল ফুটিয়ে খাবার জ্বালানি নেই। তাই এরা এমনি মরবে, অমনিও মরবে। আসগরের হাঁটতে কষ্ট হয়, তবু কষ্ট করে যেখানে বাচ্চারা ফলু ছোঁয়াচ্ছে সেখানে যায়। টফিগুলো নিয়ে তাদের ফূর্তি দেখার জন্য।

> ''আসগর বলে ফুল ছোঁয়ানো জানেন না? ফুলি ফুলি আঙুল ছোঁয়াতি হয়। এখানে ড্যাঙা জমিতে এখন পটল চাষ চলিতেছে। পটলের ফুল এল। এখন তো আর অত প্রজাপতি-টজাপতি ফড়িং টড়িং নেই, পোকা মারার মিষে সব শেষ। এ ফুলের রেণু ও ফুলি না লাগলে বীজ হবে কী করে? বাচ্চারা তাই কচি কচি আঙুলে ফল ছোয়ায়। এ ফল থেকে ও ফলে। পয়সা পায়। আমাদের মোটা আঙুলে ও কম্ম হবে না। আমার কোলে যে বাচ্চাটা দেখছিলেন ছ্যার, ফতিমা, ওরে পুষ্যি নিতি চেয়েছিলাম।... ওর তো রিকেট, ওই বাচ্চার

> হাত কখনও পুরুষ্ট হবে না, আঙুলকোনও দিন মোটা হবে না। সরু সরুআঙুলে ফুল ছোঁয়াতি পারবে। এখনি ফুল ছোঁয়াবার কাজ করে ফতিমা। ওরে জমির মধ্যে ওর মা ছেড়ি দ্যায়। আর ফতিমা হামাগুড়ি দে ফুলি ফুলি ঘুরি বেড়ায়। ফুল ছোয়ায়। পটল, করলা, ঝিঙে...।"[১৫]

এ যেন সামাজিক দলিল। এই মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানোর কেউ নেই। ফুলের মতো নিষ্পাপ বাচ্চাগুলোর কোন দোষ ছিল না। কিন্তু মানুষ না প্রকৃতি কার দোষে এদের এই অবস্থা? আসলে নিম্নবিত্ত মানুষের লড়াই করে বেঁচে থাকার সমস্যা চিরকালীন সত্য। এরা সামাজিক অবস্থাকে মেনে নিয়েছে। তবে লেখক বাচ্চাদেরকে প্রজাপতির সঙ্গে তুলনা করলেও এদের জীবনের কষ্ট, লাঞ্ছনা, বেঁচে থাকার যে পরিহাস সেই দিকটাই প্রাধান্য পেয়েছে। পরিবেশ সুস্থ হয়ে উঠলে আগামী প্রজন্ম প্রজাপতির মতো নিষ্পাপ সুন্দর হয়ে উঠবে।

তথ্যসূত্র:

১. 'গল্পগুচ্ছ-তৃতীয় খণ্ড', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, বিশ্বভারতী সৎ, কলকাতা, কার্তিক, ১৪১০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৬।

২. 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' - বিষ্ণু দে, নাভানা প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জুন-১৯৫৫, পৃ. ১৩৮।

৩. 'আরণ্যক' - বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সৎ, কলকাতা, জানুয়ারি-২০১৫, পৃ. ১০৩।

৪. স্বপ্নময় চক্রবর্তী, সেরা ৫০টি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল-২০২১, পৃ. ২৪৪।

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৬।

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৯।

৭. তদেব।

৮. স্বপ্নময় চক্রবর্তী, শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি-২০০৩, পৃ.১২৭।

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯।

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০।

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫১।

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৩।

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৪।

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৬।

১৫. তদেব।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. অনিল আচার্য্য (সম্পা:) 'সত্তর দশক (১)', অনুষ্টুপ, কলকাতা-২০০৯।

২. অনিল আচার্য্য (সম্পা:) 'সত্তর দশক (২)', অনুষ্টুপ, কলকাতা-২০০৯।

৩. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'কালের পুত্তলিকা', ৩য় সং, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল-২০০৪।

৪. আকাদেমি বানান উপসমিতি (সম্পা:), 'আকাদেমি বানান অভিধান', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, জুলাই-২০১১।

৫. উত্তম দাশ, 'হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', ২য় সং, বারুইপুর, মহাদিগন্ত- ২০০২।
৬. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, 'শতাব্দীর শেষের গল্প', মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, জানুয়ারি-২০০১।
৭. সুবল সামন্ত (সম্পা:), 'বাংলা গল্প ও গল্পকার (৩)', এবং মুশায়েরা, কলকাতা, জানুয়ারি-২০০০।
৮. সোহারাব হোসেন, 'বাংলা ছোটগল্প তত্ত্ব ও গতিপ্রকৃতি (১)', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, সেপ্টেম্বর-২০০৯।
৯. সুদেষ্ণা মৈত্র, প্রতিমা সাহা (যুগ্ম সম্পাদনা), 'স্বপ্নময় চক্রবর্তীর কথাসেলাই : পাঠকের নকশিকথা', সোম পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল-২০১৯।

সহায়ক পত্র পত্রিকা:

১. কোরক সাহিত্য পত্রিকা, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর - ১৯৯৫।
২. কোরক সাহিত্য পত্রিকা, ছোটগল্প বিশেষ সংখ্যা, শারদীয়-১৪১২ বঙ্গাব্দ।
৩. জ্বলদর্চি পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-২০১৬।
৪. তবু একলব্য সময়ের সংলাপ, মে-২০১৩।